Knowledge of Gharana System: How & why musical style of any particular family turned into a Gharana.

মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেব বা প্রথম আলমগীরের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীতে 'ঘরানা' বলে কিছু ছিল না-ছিল 'পরম্পরা' বা 'সম্প্রদায়'। এই 'পরম্পরা' বা 'সম্প্রদায়' ছিল দুরকমের,যথা- ১) আচার্য সম্প্রদায় বা পরম্পরা ২) গায়ক-বাদক-নর্তক সম্প্রদায় বা পরম্পরা। আচার্য সম্প্রদায়ে সংগীত শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের বিষয় ছিল না, সংগীত ছিল ধর্ম ও সাধনার বিষয়। সংগীতের উপর যাবতীয় বিজ্ঞান ভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা,সংগীতের প্রয়োগ এবং সংগীতের দর্শন,ভাব প্রভৃতির অন্বেষণ করাই ছিল আচার্য সম্প্রদায়ের সাধনীয় বিষয়।

সম্প্রদায় পরিভাষাটির ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ হচ্ছে- 'সম্' উপসর্গ + 'প্র' পূর্বক 'দা' ধাতু + 'ঘঞ্' প্রত্যয়।'সম্' উপসর্গের নানা অর্থের মধ্যে সুন্দর,শোভন,সুসমঞ্জস,সংগতিপূর্ণ প্রভৃতি অর্থ এখানে গ্রহণীয়।'প্র' শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট এবং 'দা' ধাতুর অর্থ দান করা। তার মানে, সব মিলিয়ে 'সম্প্রদায়' শব্দের অর্থ-কোনো সুন্দর,শোভন,সুসমঞ্জস ও সংগতিপূর্ণ বিষয় বা বিদ্যা যারা অপরকে প্রকৃষ্টরূপে বা পদ্ধতিগতভাবে দান করেন তাঁরা 'সম্প্রদায়' হিসাবে গণ্য।

ভারতীয় রীতি অনুসারে শিক্ষাদানের অধিকারী ছিলেন সম্প্রদায়ের আচার্যগণ-অন্য কারোর নয়। কারণ আচার্য হওয়ার যোগ্যতা সবার থাকে না। শাস্ত্র অনুযায়ী আচার্যগণ যে যে গুণের অধিকারী ছিলেন সেগুলি হল- স্মৃতি, মতি, মেধা, যুক্তি ও তর্কের দ্বারা মত প্রতিষ্ঠা ও শিষ্য-নিষ্পাদন। এছাড়াও ভরত নাট্যশাস্ত্রে আচার্যের ছয়টি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে- জ্ঞান,বিজ্ঞান,করণ,বচন, প্রয়োগসিদ্ধি ও নিষ্পাদন। তাহলে আমরা শিক্ষামূলক সংগীতের ক্ষেত্রে আচার্যদের কি বিশাল গুণের অধিকারী হতে হতো তা ভরতের উদ্ধৃতি থেকে সহজেই বুঝতে পারছি।

লক্ষ্যনীয়, মুঘলযুগে রচিত কোনো সংগীতশাস্ত্রের গ্রন্থে 'ঘরানা' ব্যাপারটি উল্লিখিত হয় নি।তার কারণ হচ্ছে, তখন সংগীত-ব্যবসায়ীদের 'পরম্পরা' ছিল। গায়কদের মধ্যে দুটি পরম্পরা প্রধান ছিল, একটি 'কলাবন্ত' বা ধ্রুপদ-গায়ক পরম্পরা এবং অপরটি হল 'কওল-বচ্চে' বা খয়াল গায়ক পরম্পরা। সেযুগে কলাবন্ত পরম্পরার আবার উপশ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল গাইবার ভঙ্গি বা বান বা বানী অনুসারে। আঞ্চলিক গেয়ভঙ্গির বৈশিষ্টানুসারে ধ্রুপদের চার প্রকার 'বান' বা 'বানী'-র সৃষ্টি হয়েছিল,যথা-গওরহার(গোয়ালিয়র অঞ্চলের বান),ডাগর(দিল্লীর নিকটবর্তী দ্বিগড় অঞ্চলের বান),খাণ্ডার(রাজস্থানের মালব অঞ্চলে খণ্ডহার নামক স্থানের বান) এবং নৌহার(পাঞ্জাবের নওহার অঞ্চলের বান)। যে সকল কলাবন্ত বা ধ্রুপদীয়া যে বান বা বানীর গান গাইতেন, তাঁদের নামের পাশে সেই সেই বানের নাম উল্লেখিত হতো। যেমন- শাহাব খাঁ ডাগুরী, ইমাম বক্স খাণ্ডারী, তানসেন গওরহারী প্রভৃতি।অপরদিকে 'কওল-বচ্চে' পরম্পরার গায়কগণ পরিচিত হতেন নামের পেছনে কওয়াল্ বিশেষণটি যুক্ত হয়ে, যেমন-মীর সালে কওয়াল্, রওয়া কওয়াল্, কবীর কওয়াল্ প্রভৃতি।

'মআদন্-উল্-মুসিকী' গ্রন্থের লেখক মুহম্মদ করম ইমাম্ বলেছেন যে-কওয়াল্ ও কলাবন্তগণ সে সময় সমাজে যথেষ্ট সম্মান ও খাতির পেতেন। সুলতান অলাউদ্দিন্ খলজীর সময়ে খয়াল গায়কদের কওয়াল্ এবং মুঘল সম্রাট আকবরের সময়ে ধ্রুপদ-গায়কদের কলাবন্ত বলার রীতি প্রচলিত হয়। ড. বিমল রায় মহাশয় ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর গবেষণায় সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন, কীভাবে প্রাচীন

‘সালগ-সূড’ শ্রেণীর প্রবন্ধ গান বিবর্তিত হয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ‘ ধ্রুবপদ’ গান এবং গোয়ালিয়র অধিপতি মানসিংহ তোমরের প্রচেষ্টায় নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ ‘ধুরপদ’ বা ‘ধ্রুপদ’ গানে রূপান্তরিত হয়।সুতরাং প্রমাণিত হয় যে,কলাবন্তদের দ্বারা সৃষ্ট ধ্রুপদ-ঘরানা সৃষ্টি হওয়ার অনেক আগে থেকেই কওয়াল্-দের পরম্পরায় খয়াল গানের ঘরানা সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে কওয়াল্ ঘরানা থেকে ‘কওয়াল্-বচ্চে’ ঘরানার উদ্ভব হয়েছিল।

যেহেতু,গোয়ালিয়র অধিপতি মানসিংহ তোমর আধুনিক ধ্রুপদের রূপকার ছিলেন, সুতরাং ধ্রুপদ ঘরানার উৎপত্তিও গোয়ালিয়র থেকেই হয়েছিল। তেমনি, যে কোনো খেয়াল ঘরানার উৎপত্তিতে ‘কওয়াল্-বচ্চে’ ঘরানার কোনো না কোনো গুণীর সম্পর্ক থাকতেই হবে। ‘ঘরানা’ শব্দটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ব্যবহৃত হতে থাকলেও তার উৎস কিন্তু মুঘল সম্রাট আকবরের অনেক আগে থেকেই পাওয়া যায়। কন্ঠসংগীতের ঘরানার অনুকরণে পরবর্তীকালে তন্ত্রীবাদ্য,আনদ্ধবাদ্য এবং নর্তনের ঘরানা সৃষ্টি হয়েছিল।